বনে বনান্তরে

অমল গুপ্ত

গ্রন্থতীর্থ
৬৫/৩এ, কলেজস্ট্রিট
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

ভূমিকা

অমল বাবু অরণ্যপ্রেমী। তাঁর জীবিকা তাকে এমন বিচিত্র সব অরণ্য-পর্বতে নিয়ে গেছে যে, জানলে তাঁকে ঈর্ষা করতে হয়। শুধু প্রকৃতিই নয়, প্রকৃতির মধ্যে যাদের বাস, সেই সব মানুষজনকেও তিনি দরদের চোখে দেখেছেন।

তার এই বইটিতে—(১) মহুয়া পলাশের দেশ পালামৌ, (২) মানস অভয়ারণ্যে পিকনিক, (৩) বেনুলালের 'নাথক', (৪) বাঘের ছানা দুটোর জন্য এখনও মন খারাপ করে, (৫) হাতিরা অন্যায় করে না, অন্যায় সহ্যও করেনা, (৬) একশৃঙ্গ গণ্ডারের দেশ কাজিরাঙ্গায় একদিন, (৭) স্কাইল্যাব নামের হরিজন ছেলেটি, (৮) জঙ্গলের আট প্রহর, (৯) ডায়েরীর ছেঁড়া পাতা ঃ উত্তর কাছাড়ের জঙ্গলে জঙ্গলে, (১০) পাখিদের রং-রূপ, (১১) জংলি কুকুরের শিকার ধরা খেলা, (১২) অরণ্যের অবাক কথা এই ক'টিতে অরণ্য ও আরণ্যক চিত্র আছে।

অমল বাবু পেশাতে সাংবাদিক। আসামের এবং অন্যান্য জায়গায় নানা পত্র-পত্রিকাতে বিভিন্ন সময়ে তিনি এই সব লেখাগুলি লিখেছিলেন। তারই সংকলন এই "বনে বনান্তরে"।

বনে জঙ্গলে বেড়াতে যান অনেকেই। অনেকে থাকেনও সেখানে দীর্ঘদিন কিন্তু বন-জঙ্গল ও বন-জঙ্গলের মানুষের প্রতি ভালবাসা সকলের জন্মায় না, অমল বাবুর লেখা পড়ে বোঝা গেল অরণ্য ও আরণ্যক প্রীতি তাঁর মেকী নয়।

একেকজনের দেখার চোখ এবং লেখার হাত, হাতের লেখারই মতো আলাদা আলাদা হয়। না হলেই আশ্চর্যের কথা হতো। তাই অমল বাবু তাঁর চোখে যা দেখেছেন এবং তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে যা লিখেছেন সেই টুকরো টুকরো ছবি দিয়েই বনে-বনান্তরের এই মালা গাঁথা।

বনে-বনান্তরে উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য হয়নি। তেমন যে হয়েছে সে কথা লেখক নিজেও দাবী করেন নি। কিন্তু মহৎ সাহিত্য রচনার বীজ এই বইতে সুপ্ত আছে। শুধুমাত্র কল্পনাতে ভর করেই কোনো মহৎ সাহিত্য কখনওই সৃষ্টি হতে পারে না। অভিজ্ঞতাই তার বীজ। সেই বীজ থেকে একদিন কোনো মহীরূহ যে জন্মাবে না একথা কে বলতে পারে!

বইটি পড়ে আমার ভাল লেগেছে।

বিনত—

বুদ্ধদেব গুহ
পোষ্ট বক্স নং ১০২৭৬
কলকাতা-৭০০ ০১৯

তারিখ ৯/৬/১৯৯৫

বইটি সম্পর্কে শ্রীপান্নালাল দাশগুপ্তের অভিমত

আসামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রাকৃতিক সম্পদ ছিল তার বন-সম্পদ। মানুষের লোভ সেই বন সম্পদকে বেপরওয়াভাবে উজাড় করে ফেলছে। ভবিষ্যত প্রজন্মকে এর জন্য মূল্য দিতে হবে সেকথা এখন কেউ চিন্তাও করে না। বন সম্পদ ধ্বংস করার অন্যতম কুফল হোলো বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমে যাওয়া এবং ভূমিক্ষয়।

গত কয়েক বছর ধরে আমি আসামের সরকারী-বেসরকারী নেতাদের বনসম্পদ ধ্বংসের ভয়াবহ পরিনাম সম্পর্কে বলে আসছি। আকাশ থেকে বীজ ছিটিয়ে (Aerial Seedling) বনসৃজন করার প্রস্তাব আমি দিয়েছিলাম। প্রয়োজনীয় সাহায্য করার প্রস্তাবও দিয়েছিলাম। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি।

শ্রীঅমল গুপ্ত "বনে বনান্তরে" বলে যে বইটি লিখেছেন, তাতে প্রাকৃতিক পরিবেশ—বন-জঙ্গল, গাছপালা, পরিপার্শ্বিক ইত্যাদি—সংরক্ষণের কথা বুঝিয়ে বলেছেন সহজ ভাষায়। এই বই পড়ে যদি সাধারণ পাঠক পরিবেশ সংরক্ষণে নাগরিক হিসাবে তাঁদের দায়িত্ব সম্পর্কে কতকটাও সচেতন হন, তাহলে আমি খুসী হবো।

COMPASS
14, Khudiram Bose Road,
Calcutta - 6
Phone : 555-9668

২৪.৫.১৫

মা কল্যাণী গুপ্ত কে

সূচিপত্র

মহুয়া পলাশের দেশ পালামৌ	.....	৯
মধ্যপ্রদেশের মারাণ্ডফা মন টানে	.....	১১
কোচবিহারের মেদনাবাড়ি জঙ্গলে ভৌতিক কাণ্ড	.....	১৩
মানস অভয়ারণ্যে পিকনিক	.....	১৫
বেনুলালের 'নাথক'	.....	১৮
বাঘের ছানা দুটোর জন্য এখনও মন খারাপ করে	.....	২০
হাতিরা অন্যায় করে না, অন্যায় সহ্যও করে না	.....	২২
একশৃঙ্গ গণ্ডারের দেশ কাজিরাঙ্গায় একদিন	.....	২৪
স্কাইল্যাব নামের হরিজন ছেলেটি	.....	২৭
জঙ্গলের আট প্রহর	.....	২৯
ডায়রীর ছেঁড়া পাতা ঃ উত্তর কাছাড়ের জঙ্গলে জঙ্গলে	.....	৩১
পাখিদের রূপ-রং	.....	৩৩
জংলি কুকুরের শিকার ধরা খেলা	.....	৩৫
অরণ্যের অবাক কথা	.....	৩৭
একদল বন্যপাখি বনাম মানব সভ্যতার হৃদয়হীনতা	.....	৩৯
পালকওয়ালা বন্ধুদের জীবন বৈচিত্র্য	.....	৪১
ভৌতিক পাখির কবলে	.....	৪৩
অরণ্যের ঋতু বৈচিত্র্য	.....	৪৫
অরণ্যের একটুকরো ধূসর বুনো স্মৃতি	.....	৪৭
প্রকৃতির প্রতি সদয় না হলে, প্রকৃতিও রুদ্রমূর্তি ধারণ করবে	.....	৪৯
পানবাড়ি জঙ্গলের চিঠি	.....	৫০
রাজাভাতখাওয়া জঙ্গলে	.....	৫২
বন কেটে বসতি স্থাপনের ধুন	.....	৫৪
অসমের বনজ সম্পদ বাঁশ আজ ধ্বংসের পথে এইচ. পি. সি.'র লক্ষ্য নেই	.....	৫৬
'অশ্বক্লান্ত' পথের ক্লান্তি দূর করবে	.....	৬০
গাছ-গাছালিরা কি দেশের বাকশক্তিহীন নাগরিক নয়?	.....	৬৩
প্রকৃতির সেবায় নিয়োজিত প্রাণ	.....	৬৫
পাখিবুড়ো সালেম আলি	.....	৬৭
মলিনতাহীন পরিবেশকে ভালবাসার দিন ৫ জুন	.....	৬৯
পরিবেশ আগলাতে চাই মন	.....	৭২
গুয়াহাটী চিড়িয়াখানা কীট-পতঙ্গ ও পশু-পাখি বিশ্ব থেকে মুছে গেলে ধ্বংস হবে প্রাকৃতিক ভারসাম্য, মানুষের অহঙ্কার	.....	৭৬
দাহার, বুনো হাঁস জঙ্গল রক্ষা করছে	.....	৭৯
মণিপুরে প্রথম পাখি গণনা অসমের পরিবেশ বিষয়ক শ্রেষ্ঠ ছবি 'রেপ ইন দ্য ভার্জিন ফরেস্ট'	.....	৮১
	.....	৮৩
	.....	৮৫

লেখকের কথা

আদিম মানুব ছিল প্রকৃতি নির্ভর। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের ওতপ্রোত সম্পর্ক ছিল। সভ্যতার আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে সেই সম্পর্কে চিড় ধরে। মানুষ ও প্রকৃতির মাঝে বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হয়। সেই শূন্যতা যত দীর্ঘায়িত হচ্ছে মানুষের অস্তিত্বও তত বিপন্ন হয়ে পড়ছে। প্রকৃতি ধ্বংসের ফলে সমগ্র মানব সভ্যতা আজ গভীর সংকটের মুখে পড়েছে। অরণ্যের প্রতি ভালবাসা নেই, মমত্ববোধ নেই, ভোগসর্ব্বস্য মানুষের আকাশ সমান লোভের বলি হয়েছে দিগন্ত বিস্তীর্ণ সবুজ অরণ্য।

এক পেপার মিলে কয়েক বছর কাজ করার সুবাদে দেশের কয়েকটি জঙ্গলের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। সেই পরিচয় থেকে ভালবাসা, ভালবাসা থেকে আত্মীয়তা, সেই আত্মীয়তা থেকে গভীর প্রেম। সেই প্রেমে আজও আমি মশগুল, আচ্ছন্ন। একদিন ছিলাম ঘাতক। আক্ষরিক অর্থে কসাই। জঙ্গলের কাঠ, বাঁশ নির্মমভাবে কাটিয়ে সাঙ্গ করে দিতাম। শক্ত ইস্পাতের কুঠারের আঘাতে প্রিয় গাছগুলি থর থর করে কেঁপে উঠত। কচি কচি ডাল পাতাগুলি যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠতো। একসময় ঠিকাদারবাবুদের পায়ের নীচে মুখ থুবড়ে পড়তো। সেই অভাগা গাছগুলির যন্ত্রণা আমি গভীরভাবে উপলব্ধি করেছি। বুলডোজারের জোর ধাক্কায় গাছগুলি নিমেষে ধূলোয় লুটিয়ে পড়তো। তাঁদের করুণ আর্তনাদ আজও আমাকে পীড়া দেয়। ঘরভাঙা হাতীদের কান্না আমি শুনেছি। ঝরা পাতার মর্ম্মর ধ্বনি আজও আমায় ভাবায়। জঙ্গল ছেড়ে আজ আমি গুয়াহাটি মহানগরীর ইট, কাঠ, পাথর কংক্রিটের খাঁচায় বন্দী। স্বার্থপর ভোগসর্ব্বস্য মানুষের ভীড়ে দম আটকিয়ে যায় কিন্তু উপায় নেই, তাদের কথাও লিখতে হয়। সাংবাদিকতা আমার পেশা, কিন্তু নেশা নয়। নেশা আমার জঙ্গল। সময় সুযোগ পেলেই জঙ্গলে ছুটে যাওয়া। সেই জঙ্গলের প্রতি ভালবাসার সামান্য নিদর্শন ''বনে বনান্তরে''।

উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রধান রাজ্য অসম পাহাড়ে ঘেরা, মহাবাহু ব্রহ্মপুত্র স্নেহচ্ছায়া দিয়ে ঘিরে রেখেছে। নিসর্গ শোভা মনোরম রূপের জন্য বিখ্যাত। এই বইয়ে রাজ্যের কয়েকটি মনোরম স্থানের কথাও তুলে ধরা হয়েছে। সেই একই লক্ষ্য প্রকৃতিকে ভালবাস, বন সংরক্ষণ কর।

গুয়াহাটি থেকে প্রকাশিত 'দৈনিক যুগশঙ্খ', 'সময় প্রবাহ', পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার 'এই সময়', 'কান্দী বান্ধব', জলপাইগুড়ি জেলা থেকে প্রকাশিত 'পরমাণু',

কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'পাড়ানী' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন সময় বন এবং পরিবেশ বিষয়ের লেখাগুলির সংকলন হচ্ছে 'বনে বনান্তরে'। সময়কে ধরে রাখার জন্য কোনও পরিবর্তন করা হয়নি। কিছু ভুল ভ্রান্তি থেকে গেছে। তার জন্য ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

'আজকাল'-এর বার্তা সম্পাদক রাজীব ঘোষ, 'সময় প্রবাহ'-র সাংবাদিক গৌতম চট্টোপাধ্যায়, 'দৈনিক যুগশঙ্খ'র (শিলচর) সাংবাদিক নকুল মণ্ডল, অসম বিধানসভার অধ্যক্ষ দেবেশ চক্রবর্তী, অসমের খাদ্যমন্ত্রী ডাঃ অর্ধেন্দু কুমার দে, বিহারের মজফ্ ফরপুর বি, বি, আম্বেদকর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান শ্রীমতি মুকুল বন্দ্যোপাধ্যায়, আলোক চিত্রী অশোক দাশগুপ্ত, দেশের অন্যতম স্বাধীনতা সংগ্রামী তথা পরিবেশবিদ পান্নালাল দাশগুপ্ত, দেশের বিশিষ্ট সাহিত্যিক বুদ্ধদেব গুহ আমার ভাই অরূপ গুপ্ত, ভাইপো সব্যসাচী গুপ্ত, ক্রান্তি প্রেসের স্বত্ত্বাধিকারী কমলাক্ষ ব্রহ্মচারী এবং স্বপনকুমার কর্মকার সহ ক্রান্তি প্রেসের কর্মীদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা ব্যতীত বইটি প্রকাশ করা যেত না। কলকাতার গ্রন্থতীর্থ প্রকাশন সংস্থা আমার গ্রন্থটির দ্বিতীয় প্রকাশনের ব্যবস্থা করে দেওয়ায় অলোক মজুমদার সহ ঐ প্রকাশন সংস্থার সকলের প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। অসমের মাননীয় রাজ্যপাল লোকনাথ মিশ্র গুয়াহাটি প্রেস ক্লাবে বইটিকে ১৯৯৫ সালের ৬ আগষ্ট আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করে আমাকে সাহায্য করেছেন। বইটির গুরুত্ব বাড়িয়েছেন। সবার প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

বইটি পড়ে যদি কারো অরণ্য, পাহাড় বা এককথায় প্রকৃতির প্রতি বিন্দুমাত্র আগ্রহ জন্মায় তবে আমার শ্রম সার্থক হয়েছে বলে ভাববো।

—অমল গুপ্ত

গুয়াহাটি
নভেম্বর, ১৯৯৬

মহুয়া পলাশের দেশ পালামৌ

ধানবাদ-গোমো জংশন থেকে বরকাখান্না হয়ে লাইনটা পাহাড় জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চলে গেছে। ঐ লাইনেই বিহারের পালামৌ জেলা পড়বে। মহুয়ামিলন, ডালটনগঞ্জ, গাড়োয়া রোড প্রভৃতি রেল স্টেশন পালামৌ, জেলার মধ্যেই পড়ে। বিহারের অদ্ভুত এক জেলা এই পালামৌ। অভাব দারিদ্র্যে-অনগ্রসরতার মধ্যেও পালামৌ জেলার নিজস্ব এক সৌন্দর্য আছে। নানা উপজাতি ও হরিজন সম্প্রদায়ের বাস এই জেলায়।

প=পলাশ, লা=লাক্ষা, মৌ=মহুয়া—এই তিন প্রাকৃতিক সম্পদই জেলার দরিদ্র মানুষগুলিকে বাঁচিয়ে রেখেছে। পাহাড়, প্রকৃতি অরণ্যে ঢাকা পালামৌতে যেমন ঠাণ্ডা তেমনি গরম। গ্রীষ্মকালে ৪৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপমাত্রা বাড়বে। প্রচণ্ড গরমে পালামৌর অধিবাসীরা যখন জ্বলেন তখনই প্রকৃতি তার সৌন্দর্যের অপার ডালি সাজিয়ে তাদের সামনে হাজির হয়। চারিদিকে জলকষ্ট, এক ফোঁটা জল থাকে না। নদী-নালা সব শুকিয়ে যায়।

রেলওয়ে থেকে স্টেশনে স্টেশনে জল সরবরাহ করা হয়। যত গরম বাড়বে লক্ষ কোটি পলাশ ফুলও তত রক্তবর্ণ উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। যত গরম বৃদ্ধি পাবে মহুয়া ফুলগুলো ততই মুক্তোর দানার মত টুপ টুপ করে ঝরে পড়বে। রক্ত-ঝরানো পলাশ ফুলকে কোনও এক কবি 'ফ্লেল্‌ম অফ দ্য ফরেস্ট' বলে বর্ণনা করেছে।

গ্রীষ্মের দাবদাহে যখন পালামৌ জ্বলে তখন প্রকৃতিও লালে লাল হয়ে ওঠে। জেলার গরিব অধিবাসীরা পলাশ ফুলগুলির দিকে চেয়ে থাকেন। ফুলগুলি যত লাল, উজ্জ্বল হবে তাদের ভাগ্যও তত সুপ্রসন্ন হবে। কারণ বেশি গরম পড়লেই রক্তবর্ণের ফুলগুলি যেমন আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, তাঁদের প্রাত্যহিক জীবন জীবিকার উৎস মহুয়া ফুলও তত ঝরে পড়বে। সারা বছরের জন্য মহুয়া ফুল সংগ্রহ করে রাখা হয়। কিসমিসের মত দেখতে প্রচণ্ড মিষ্টি এই ফুল মদ তৈরি ছাড়াও নানা ধরনের দৈনন্দিন খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া মহুয়া ফলও ঘানিতে পিষে তেল হিসাবে, ব্যবহৃত হয়। মহুয়া গাছের ছাল ওষুধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। পালামৌতে একটি মহুয়া গাছকে একটি গরুর বিকল্প হিসাবে ধরা হয়। জোত-জমি-গবাদি পশুর থেকে মহুয়াগাছকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। প্রায় প্রতিটি বাড়িতে গ্রামবাংলার ধানের গোলার মত মহুয়ার ফুল সংগ্রহের জন্য গোলা আছে। আটার সঙ্গে মহুয়া ফুল মিশিয়ে ভাজা-ভুজি করে, অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী তৈরি করে খেলে শরীরের পুষ্টি বাড়ে। মহুয়া ফুলের মধ্যে অ্যালকোহলিক পদার্থ থাকায় অল্পকিছু খেলেই নেশা ধরে যায়। বেশি খেলে নাক দিয়ে রক্ত ঝরে। মহুয়া ফুলের গাছগুলির নিচে প্রায়ই বুনো ভালুককে শুয়ে থাকতে দেখা যায়। মহুয়া ফুল ভালুকের খুব প্রিয় খাদ্য। বেশি পরিমাণ খেয়ে নেশাগ্রস্থ হয়ে তারা গাছের নিচে পড়ে থাকে।

পালামৌর অপর প্রাকৃতিক সম্পদ লাক্ষা। পালামৌ জেলাতে মহুয়া, পলাশ গাছ ছাড়াও লক্ষ লক্ষ বুনো কুল গাছ আছে। ঐ গাছ গুলিতেই লাক্ষা কীটের জন্ম হয়। ঐ কালো কালো লাক্ষা কীটের বিষ্ঠা থেকেই গালা উৎপাদিত হয়। গ্রামোফোন রেকর্ড তৈরি ও অন্যান্য কাজে গালা কাজে লাগে। পলাশ-লাক্ষা-মহুয়া জেলার গরীব মানুষগুলোকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

আমি পালামৌর চৈতি-পলাশ-মহুয়ার সৌন্দর্য্য আকণ্ঠ পান করে আজও নেশাগ্রস্থ। এখানে গ্রীষ্মের দাবদাহে যখন জ্বলি তখন লক্ষ কোটি পলাশ ফুলের জন্য মন কেমন করে।

পালামৌর রুক্ষ, রং-হীন, তৃণহীন অসংখ্য ন্যাড়া পাহাড় যেন আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকে। রিক্ত এই পাহাড়গুলির দিকে তাকিয়ে মনটা স্বভাবতই খারাপ হয়ে যায়। তাদের বুকে ঘন সবুজ গাছের স্নিগ্ধ ছায়া নেই, পাহাড়ী ঝর্নার স্নিগ্ধ ভাষা তাদের জানা নেই। পাখীদের গান তারা শুনতে পায় না, তাই তৃণহীন জলহীন শুষ্ক রুক্ষ পাহাড় দেখে আমার করুণা হয়। অপরদিকে যখন আবার ভোরের সূর্যোদয়ের লাল গভীর আভার পরশ গায়ে মেখে ঘুম ভাঙে, পূর্ণিমা রাতের সোনালি চাঁদের আলোর পরশে রাঙিয়ে ঐ পাহাড়গুলিই যখন আদিবাসীদের মাদলের শব্দ শুনে শিহরিত হয় বা প্রতিদিনের পশ্চিমাকাশের গোধূলির সিঁদুর রাঙা আকাশের রক্তিমতা আর রক্ত পলাশের লাল মখমলের চাদর গায়ে চড়িয়ে পাহাড়গুলি যখন মহুয়া ফুলের উগ্র গন্ধে নেশাগ্রস্থ হয়ে ঝিমিয়ে পড়ে, তখন আমার ঐ ন্যাড়া রঙহীন পাহাড়গুলিকে দেখেই হিংসা হয়। বড় ভালবাসতে ইচ্ছা করে। এমন শূন্যতার মাঝে, রূপহীনতার মাঝে এই অপরূপ সৌন্দর্যভরা জগতের সন্ধান পেয়ে আমি মুগ্ধ আমি ধন্য।

মধ্যপ্রদেশের মারাগুফা মন টানে

আমি উত্তর প্রদেশের মির্জাপুর জেলার রেনুকুট শহর থেকে প্রায় তিনটি বাস পাল্টে সপ্তাহে একবার মারাগুফা সংলগ্ন সরগুজা জঙ্গলে বাঁশ সংগ্রহের কাজ তদারক করতে যেতাম। প্রায় ১২ ঘণ্টার মত বাসে গিয়ে পৌঁছতাম কর্মস্থলে। দিনে একটি মাত্র বাস। এই অঞ্চলে বাসে টিকিটের বদলে কনডাক্টর হাতের তালুতে কালির আঁচড় টেনে দিত। এমন অদ্ভুত নিয়ম আর কোথাও দেখিনি। ঐ অঞ্চলের অধিকাংশ মানুষ দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করেন। ২টাকা ৩টাকা মজুরীতে দিনভর কাজ করতেন। পয়সা দিয়েও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্র পাওয়া যায় না। অর্থনীতির 'বাটার সিসটেমের' মত জিনিসপত্রের বিনিময় প্রথা আজও চালু আছে। গাছের দুটি-চারটি পান-সুপারি দিয়ে কারও কাছ থেকে লবণ বা চিনি নিলাম, অথবা আমি গামছা বুনে দিলাম, নাপিত আমার চুল কেটে দিল, এই ধরনের প্রথা চালু আছে।

জায়গাটি মধ্যপ্রদেশের উপজাতি অধ্যুষিত সরগুজা জেলার মধ্যে পড়ে। কাঞ্চল, লামপাতিয়া, শাল, শিমুল, পলাশ, মহুয়া হাজারো গাছের ভিড়ে ঢাকা ছায়াঘন শীতল মনোরম একটা পাহাড়ি অঞ্চল। প্রায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন মনে হয় যেন পৃথিবীর শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছি। বড় নীল আকাশটি যেন এখানেই থেমে গেছে। মধ্য প্রদেশের পুরনো স্মৃতিচিহ্নগুলির মধ্যে অন্যতম 'মারাগুফা' হাজার বিস্ময় নিয়ে আজও দাঁড়িয়ে আছে। ভাল যোগাযোগ ব্যবস্থা না থাকায় সেখানে কৌতূহলী পর্যটকদের পদচিহ্ন পড়ে না বললেই চলে। মধ্য প্রদেশের পাহাড়ে পাহাড়ে বিস্ময়কর যে সব ঐতিহাসিক স্থাপত্যকীর্তি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে 'মারাগুফা' তারমধ্যে অন্যতম। সরগুজার রাজা মহারাজাদের পূর্বপুরুষদের তৈরি মারাগুফার দুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখলে বড় কষ্ট হয়। অনাদর অবহেলায় উজ্জ্বল স্মৃতিচিহ্ন কালের অতলে তলিয়ে যাচ্ছে ক্রমশ।

সপ্তাহে একদিন মাত্র হাট বসে। হাটে যৎসামান্য নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী পাওয়া যায়। নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী বলতে লবণ, কেরোসিন প্রভৃতি। ঐ অঞ্চলের আদিবাসীরা দিনের আলোতেই রান্না-বান্না করে খেয়ে নেয়। রাতে আলো জ্বালে না বললেই চলে। দারিদ্র্যের সঙ্গে একরাশ কালো অন্ধকার তাদের জীবনে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রয়েছে। পেট ভর্তি খাবার বলতে ডাল ভাত নয়, ওরা পেট ভরে হাড়িয়া (একপ্রকার স্থানীয় মদ) খায়। তাদের কোনোও সরকার নেই। একমাত্র ঈশ্বরই তাদের রক্ষাকর্তা। তাদের জীবনের আনন্দ বলতে পেট ভর্তি হাড়িয়ার নেশা। মেয়েরা হাঁটুর উপর ৬/৭ হাত লম্বা ছোট কাপড় পরে। ছেলেরা আণ্ডার ওয়ারও নয়—ছোট মাপের একটি করে লেংটি পরে।

উপজাতিরা বিস্ফোরক পদার্থ পটাশ এবং গন্ধকের গুঁড়োর সঙ্গে ছোট ছোট তারকাঁটা ও কাঁচের টুকরো মিশিয়ে কাগজের মোড়কে পুরে পটকা তৈরি করে। পটকার গায়ে চর্বি জাতীয়

কিছু মাখিয়ে দিয়ে গভীর জঙ্গলের মধ্যে রেখে আসে। চর্বির গন্ধে বুনো শুয়োর ঐ পটকায় কামড় দেয়। পটকা মুখের মধ্যেই বিস্ফোরিত হয়। দাঁতাল বুনো শূয়োরের মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যায়। মাথাটা বাদ দিয়ে বাকি অংশ ওরা খায়। তেল মশলাহীন আধ কাঁচা শুয়োরের মাংসের সঙ্গে হাড়িয়ার সংমিশ্রণে বিরাট ভোজ হয়। উপজাতি বস্তিতে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। প্রায় রাতেই বস্তিতে গবাদি পশুর লোভে বাঘ হানা দিত। ওখানে কোনদিন রাতে আমি বাঘের ভয়ে ঘুমোতে পারিনি। গা ছম ছম করতো। রাত কাটতে চাইত না। মারাগুফা পাহাড় ভর্তি নানাবিধ ছোট স্থাপত্য কীর্তির ভিতরে দীর্ঘ গুহা। ধূপের গন্ধ। ছোট কুঠুরি বাঘে মাংস খাওয়া টাটকা হাড়ের ছড়াছড়ি। গভীর জঙ্গলে ঢাকা মারাগুফা এক অপার বিস্ময় হয়ে আজও দাঁড়িয়ে আছে। শাল মহুয়ার ফাঁকে যখন পূর্ণিমার বিরাট চাঁদ ওঠে তখন ঐতিহাসিক স্মৃতি বিজড়িত পূর্বসূরী কুশীলবরা সব জেগে ওঠে। আর গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন থাকে সহজ সরল অধিবাসীরা।

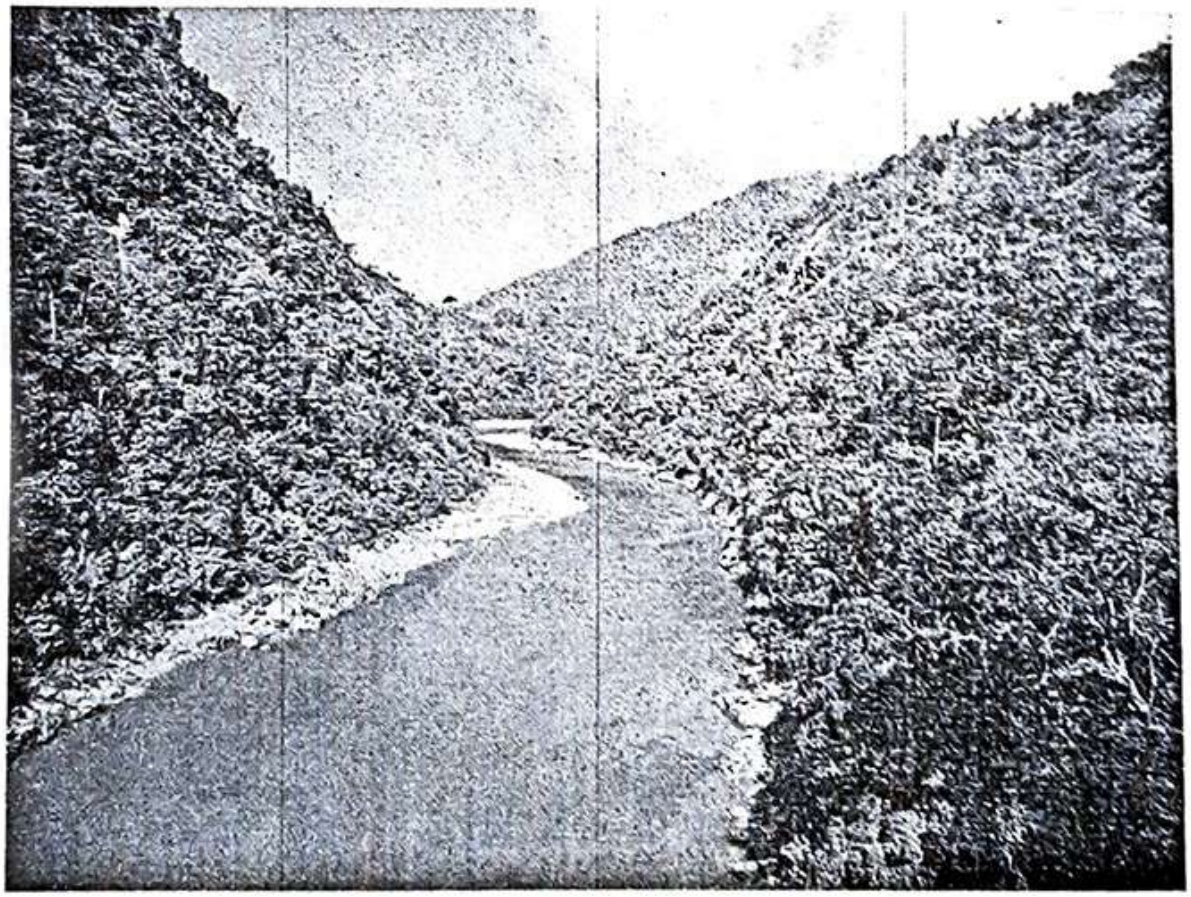

কোচবিহারের মেদনাবাড়ি জঙ্গলে ভৌতিক কাণ্ড

সালটা ঠিক মনে নেই। কোচবিহার ফরেস্ট ডিভিশনের অধীনে মেদনাবাড়ি জঙ্গলে কিছুদিন ছিলাম। ঐ জঙ্গলের বিশেষ একটা দিনের কথা আমাকে আজও ভাবায়। চারিদিকে গভীর বিস্তীর্ণ জঙ্গল। জঙ্গলের ভেতরেই বিট অফিস সংলগ্ন একটা দু'তলা কাঠের বাড়িতে আমি থাকতাম। জায়গাটা প্রচণ্ড নির্জন। নিরিবিলি পরিবেশে গাছের পাতা ঝরার শব্দ ছাড়া কিছুই শোনা যায় না। সর্বক্ষণ মনের অজানা কক্ষে ভয় ও আতঙ্কের এক সূক্ষ্ম অনুভূতির ঘণ্টা বেজে চলে। মাঝে মধ্যে হরিণের ডাক ও গাছভর্তি বাঁদরের চেঁচামেচি নিরিবিলি পরিবেশে ছেদ টেনে দিত। যত আতঙ্ক যত ভয় সব যেন রাতের প্রতীক্ষায় ওৎ পেতে থাকতো। কিছুতেই রাত কাটতে চাইতো না। এক একদিন হাতির প্রচণ্ড ডাক যেন ২০ হাজার টন টিএনটি বোমার বিস্ফোরণের মতো শোনাতো। পোড়ো কাঠের ঘর থর থর ক'রে কাঁপতো, যেন টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়বে।

কোনও এক মেঘলা রাতে স্টোভে রান্না চাপিয়েছি। আকাশে একটাও তারা নেই, জঙ্গলের গভীর অন্ধকারে সর্বত্র ঢাকা পড়ে গেছে। হঠাৎ গাছপালা ভাঙার শব্দ শুনে দেখি ছোট্ট দাঁতাল হাতি আমার ঘরের দিকেই এগিয়ে আসছে। আমি সঙ্গে সঙ্গে হাতে টর্চ লাইট নিয়ে ঘরের ল্যাম্প এবং স্টোভ নিভিয়ে ফেলি। কারণ বন্য জন্তুরা অন্ধকার রাজ্যের জীব সব—আলোর মাঝেই চক্রান্তের বীজ নিহিত আছে বলে মনে করে। এই মুহূর্তে যতবড় নাস্তিকই হোকনা কেন সবাই ঈশ্বরের নাম স্মরণ করতে বাধ্য। আমিও এ থেকে ব্যতিক্রম নই। হাতিটা ঘরের একটি খুঁটিতে গা ঘষে সামনের কলাগাছের ঝাড় থেকে একটা গাছ দাঁত দিয়ে ফেড়ে মাঝের অংশটা (থোড়) খেয়ে জঙ্গলেরই আর একটা হাতির ডাক শুনে এক হুঙ্কার ছেড়ে জঙ্গলের গভীরে ঢুকে যায়। আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচি। সম্ভবত ঐ সময়টা পূর্ণিমার রাত ছিল। জঙ্গলের মানুষের কাছে পূর্ণিমার রাত বলে কিছু নেই। যেন রাশি রাশি অনড় অন্ধকার জঙ্গলের মানুষগুলোকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তাদের কাছে পূর্ণিমার চাঁদ যে রূঢ় কঠোর বাস্তব দিয়ে তৈরি কবি সুকান্তের "ঝলসানো রুটি"।

আলো আঁধারির রাত। বাইরে চলেছে ঝড়ো বাতাসের তাণ্ডব। আমি ফের রান্নার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। হঠাৎ এক দমকা হাওয়ায় আমার ঘরের ছিটকিনি খুলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বাতিও নিভে যায়। সেই মুহূর্তে আমি দেখতে পাই আমার দরজার ঠিক উপর থেকে ছোট্ট একটি চিঠি ঘুরপাক খেতে খেতে পড়ছে। আমি তো ভয়ে কাঁটা হয়ে আছি। ঐ চিঠিটিকে হস্তগত করে হাতে টর্চ